



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 01 - 07

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

‘অভিসার’ পর্যায়ে পদ রচনায় বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস এবং জ্ঞানদাস : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

মৌসুমী দাস

Email ID: dasm02659@gmail.com

ORCID ID 0009-0009-3951-0079

Received Date 28. 09. 2025

Selection Date 15. 10. 2025

Keyword

Bengali
Literature,
Vaishnava
Padavali,
Abhisar,
Humanity,
Vidyapati,
Chandidas,
Govindadas,
Gyanadas.

Abstract

Generally, the medieval period is referred to as an era of deity-centered literature, because throughout the entire period, devotional lyrical poetry glorifying deities held a dominant place as a subject of literary practice. This is not untrue, yet it is not the whole truth either. In this period, although the literary works created by the poets give prominence to the divine, they contain even more human elements. A large part of medieval Bengali literature is occupied by the vaishnava padavali. Although the miraculous love-play of Radha and Krishna is the central theme of the vaishnava padavali, we would say that the vaishnava padavali is not merely songs of the deities, but also an expression of the story of human life. The intention here is not to describe the divine plays of the deities, rather the focus of discussion has been on how the works of pre-chaitanya poets like vidyapati and chandidas differ from those of post-chaitanya poets like Govindadas and Gyanadas particularly as seen in the Abhisar-phase poems.

Discussion

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্য বিস্তারের ক্ষেত্র সুবিশাল। মোটামুটিভাবে কালগত বিচারে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যকে আমরা তিনভাগে ভাগ করতে পারি – (ক) প্রাক্ চৈতন্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলী, (খ) চৈতন্য সমসাময়িক এবং (গ) চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব পদাবলী। যাঁরা বিষ্ণুর উপাসক তাঁরাই হলেন বৈষ্ণব। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলা সাহিত্য সাধারণত পৌরাণিক কাহিনি, দেবদেবীর উপাখ্যান, এবং অতিপ্রাকৃত কাহিনিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল কিন্তু চৈতন্যদেবের পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্য অতিপ্রাকৃত শক্তির বন্ধন থেকে ধীরে ধীরে মুক্তি লাভ করে। চৈতন্যদেব হলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি সমস্ত ধর্ম ও মতবাদের উর্ধ্বে মানুষকে স্থান দিয়েছিলেন। তিনি বললেন প্রেমই হল ঈশ্বরকে পাওয়ার একমাত্র পথ। তিনি বৈষ্ণবের একটি নতুন সংজ্ঞা দিলেন –

“তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিসুঃ।

অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।”

অর্থাৎ যিনি তৃণের থেকেও নিজে থেকে নিচু ভাববেন, যিনি বৃক্ষের মতো সহিসু হবেন, যিনি অমানীকে মান দেবেন তিনিই বৈষ্ণব।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই রাধা কৃষ্ণের পদাবলী প্রচলিত ছিল কিন্তু চৈতন্যোত্তর যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। চৈতন্যকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা পূর্ণ ঈশ্বর বিবেচনা করেছিলেন। ভক্ত বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন বহিরঙ্গে রাধা এবং অন্তরঙ্গে কৃষ্ণ – এটা তত্ত্বগত দিক। চৈতন্যোত্তর যুগে যখন গৌড়ীয় ভাবনা, দর্শন নিয়ে চর্চা শুরু হল তখন রাধা কৃষ্ণের পদাবলীকে বৈষ্ণব কবির কয়েকটি অংশে বিভক্ত করলেন – পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, রসোদগার, প্রেমবৈচিত্র্য, আক্ষেপানুরাগ, মাথুর প্রভৃতি।

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের একটি অন্যতম রসপর্যায় বা বলা যেতে পারে সর্বোৎকৃষ্ট রসপর্যায় হল অভিসার যেখানে কান্তার্থিনী রমণী সংকেতকুঞ্জে গমন করেন আরাধ্য কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য। অভিসার পর্যায়কে অবলম্বন করে অনেক পদকর্তাই পদ রচনা করেছেন, তবে পদাবলী সাহিত্যে অভিসার পর্যায়ের পদ রচনায় যেসমস্ত পদকর্তার পদ আমরা সর্বাধিক পরিমাণে পাই তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস এবং জ্ঞানদাস। বৈষ্ণব তাত্ত্বিকেরা অভিসারে নিযুক্তা নারীর একটি বিশেষ সংজ্ঞা দিয়েছেন ‘উজ্জ্বলনীলমণি’ গ্রন্থে। সেখানে বলা হচ্ছে –

“যাভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং বাভিসরত্যপি।

সা জ্যোৎস্নী তামসী যানযোগ্যবেশাভিসারিকা।।”^২

অর্থাৎ যিনি কান্তকে অভিসার করান এবং নিজে অভিসার করেন বৈষ্ণব পদকর্তারা তাকে অভিসারিকা নারী বলেছেন। প্রকৃতির সময়ভেদে আট ধরনের অভিসারের কথা পাওয়া যায় বৈষ্ণব তত্ত্বে, যথা – ১. জ্যোৎস্নাভিসার, ২. তামসী অভিসার, ৩. বর্ষাভিসার, ৪. দিবাভিসার, ৫. কুজ্জটিকাভিসার, ৬. তীর্থযাত্রাভিসার, ৭. উন্মত্তাভিসার এবং ৮. সঞ্চরাভিসার। আর অভিসারের পদকে বিভাজন করে ৩টি পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ক) ভাবী অভিসার, খ) ভবন অভিসার এবং গ) ভূত অভিসার। অভিসারের পটভূমিকা যখন ঘর, অর্থাৎ রাধা যখন অভিসারে যাবেন, অভিসারের ভাবনা তার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করেছে অর্থাৎ মানসিক ভাবনার প্রসঙ্গ আসছে, কায়িকভাবে চলা শুরু হচ্ছে না সেটা ভাবী অভিসার। অভিসারের পটভূমিকা যখন পথিমধ্যে অর্থাৎ দুর্গম পরিবেশ, ঝড়-বৃষ্টি, রোদ থাকবে তখন সেটা ভবন অভিসার আর পটভূমি যখন সংকেতকুঞ্জে তখন তাকে বলা হয় ভূত অভিসার।

বৈষ্ণব পদাবলীতে নায়িকার অভিসারকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। স্বকীয়া প্রেমের কথা বৈষ্ণব পদাবলীতে আমরা সেভাবে পাই না। বৈষ্ণব তাত্ত্বিকদের মতানুযায়ী রাধা-কৃষ্ণ সাধারণ নরনারী নন, কৃষ্ণ আরাধ্য, রাধিকা আরাধিকা। আরাধনার ব্যাপারটা যত বিপদসঙ্কুল হবে, দুর্গম হবে ততই আরাধিকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হবে। স্বকীয়া প্রেম সমাজসাপেক্ষ সেখানে কোনো বাধা নেই। পরকীয়া প্রেম শ্রেষ্ঠ কারণ সে প্রেমে বাধা আছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলছেন-

“পরকীয়া-ভাবে অতি রসের উল্লাস।

ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস।।”^৩

অভিসারের প্রথম বাধা বাড়ির বাধা, দ্বিতীয় বাধা সমাজ আর তৃতীয় বাধা পরিবেশ প্রকৃতি। কিন্তু পরমেশ্বরের আহ্বান যদি কেউ শুনতে পায় তাহলে আর কোনো পার্থিব বাধা তাকে বেঁধে রাখতে পারে না। দুর্যোগপূর্ণ বর্ষার রাত্রি, মেঘের গর্জন, বিদ্যুতের চমক – সমস্ত কিছু তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় –

“অপূর্ণ যখন চলেছে পূর্ণের দিকে

তার বিচ্ছেদের যাত্রাপথে

আনন্দের নব নব পর্যায়।

যে অভিসারিকা তারই জয়,

আনন্দে সে চলেছে কাঁটা মাড়িয়ে।

বাঞ্ছিতের আহ্বান আর অভিসারিকার চলা

পদে পদে মিলছে একই তালে।

তাই নদী চলেছে যাত্রার ছন্দে,

সমুদ্র দুলছে আহ্বানের সুরে।”^৪

চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগের পদকর্তারা যেমন অভিসার বিষয়কে অবলম্বন করে পদ রচনা করেছেন তেমনি চৈতন্য পরবর্তী যুগের পদকর্তাদের রচনার মধ্যেও অভিসার প্রাধান্য পেয়েছে। চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে যে একটা নবজাগরণের সূচনা হল তার প্রভাব চৈতন্য পরবর্তী যুগের পদকর্তাদের রচনায় লক্ষ করা যায়। ফলত উভয় যুগের পদকর্তাদের রচনার মধ্যে বেশকিছু বৈসাদৃশ্য থাকবে- এটাই স্বাভাবিক। এখানে আমরা চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগের বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দুজন কবি বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাস আর চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দু'জন কবি - গোবিন্দদাস এবং জ্ঞানদাসের অভিসার বিষয়ক পদাবলীর মধ্যে পার্থক্য কোথায় তা তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

মাথুর পর্যায়ের পদ রচনায় যদি বিদ্যাপতিকে শ্রেষ্ঠ বলা যায় তেমনি অভিসার বিষয়ক পদ রচনায় যাঁর নাম সর্বাত্মে উল্লেখ করতে হয় তিনি হলেন গোবিন্দদাস কবিরাজ। তবে বিদ্যাপতিরও বেশ কিছু অভিসার বিষয়ক পদ পদাবলী সাহিত্যে পাওয়া যায়। একজন ছিলেন চৈতন্য পূর্ববর্তীকালের কবি। আর একজন হলেন চৈতন্য পরবর্তীকালে কবি। এই উভয় যুগের পদকর্তাদের পদের আলোচনা করলে বেশ কিছু বৈসাদৃশ্য আমরা দেখতে পাবো -

বিদ্যাপতির অভিসার বিষয়ক একটি পদ -

“কহ কহ সুন্দরি না কর বেআজ।
দেখিঅ আজ অপূর্বব সাজ।।
মৃগমদপঙ্ক করসি অঙ্গরাগ।
কোন নাগর পরিনত হোঅ ভাগ।।”^৫

পদটি আলোচনা করলে আমরা দেখব, রাধা হঠাৎ অপরূপ সাজ সেজেছে। সর্বাত্মে কস্তুরী তিলক মেখে নীলবস্ত্র পরিধান করে বারবার উঠে পশ্চিমদিকে দেখছেন কখন দিন শেষ হবে, চোখ বন্ধ করে বিনা কারণে গৃহে যাতায়াত করছেন - এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, তিনি অন্ধকারে যাওয়ার অভ্যাস করছেন অর্থাৎ শ্রীমতী রাধা এখানে অভিসার যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

এরপরে গোবিন্দদাস যখন রাধার অভিসার যাত্রার প্রস্তুতি দেখাচ্ছেন -

“কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জির চীরহি বাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করু পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি।।”^৬

আপাতভাবে এটি ভাবী অভিসার পর্যায়ের পদ। কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে রাধা অভিসারে যাবেন তার প্রস্তুতির পদ। একদিকে যেমন তিনি প্রকৃতির কথা বলছেন, নারীর অভিসারের প্রস্তুতির কথা বলছেন তেমনি অন্যদিকে একনিষ্ঠ আরাধিকাকে পাচ্ছি - এখানেই কবির কৃতিত্ব। শুরু করলেন কৃষ্ণের সংকেতকুঞ্জে রাধার যাত্রার প্রস্তুতি দিয়ে, প্রকৃতির বিপদসঙ্কুলতার চূড়ান্ত ছবি আমাদের সামনে আনলেন। সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছে যাবার জন্য যে ঐকান্তিক সাধনা গোবিন্দদাস এই পদটির মধ্যে একেছেন তা এককথায় অসাধারণ। দুটি পদের মধ্যেই রাধার অভিসার যাত্রার প্রস্তুতি, পার্থক্য রয়েছে যেমন কাব্যরূপের মধ্যে তেমনি গোবিন্দদাসের লেখা এই পদটি শুধুমাত্র রাধা কৃষ্ণের পদ হয়ে থাকেনি চিরন্তন প্রেমিক প্রেমিকার পদ হয়ে উঠেছে।

বিদ্যাপতির আর একটি পদে আমরা দেখি রাধা সখীকে সম্বোধন করে তার অভিসারে যাত্রার প্রতিবন্ধকতার কথা বলছেন -

“রয়নি কাজর বম ভীম ভুজঙ্গম
কুলিস পরএ দুরবার।
গরজ তরজ মন রোস বরিস ঘন
সংসঅ পড় অভিসার।।”^৭

আর গোবিন্দদাসের পদে যখন সখী রাধাকে নিবৃত্ত করার জন্য অভিসারে যাত্রার প্রতিবন্ধকতার কথা বলছেন -

“মন্দির বাহির কঠিন কবাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।।
তঁহি অতি বাদর দরদর রোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল।।
ঘন ঘন বান বান বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণ মরম জরি যাত।।
দশদিশ দামিনি দহন বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন তার।।”^৮

দুটি পদেই রয়েছে বর্ষামুখর প্রকৃতি, অভিসারের প্রতিকূল পরিবেশ কিন্তু পার্থক্য রয়েছে বলার ভঙ্গিতে। বিদ্যাপতির বর্ণনার মধ্যে দিয়ে আমরা রাধা চরিত্রের একটি নুতন দিক দেখতে পাই তা হল প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য তিনি অভিসারে যাচ্ছেন। তিনি কৃষ্ণকে কথা দিয়েছেন তাই তিনি অভিসারে যাচ্ছেন। এই রাধা গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের রাধা নন, এখানে তিনি একজন মানবী নায়িকা যিনি তার প্রেমিককে কথা দিয়েছেন তাই তিনি অভিসারে যাচ্ছেন। কিন্তু গোবিন্দদাস রাধার চরিত্র অপেক্ষা প্রকৃতিকে একটি জীবন্ত চরিত্র করে তুলেছেন। এই বিষয়ে শঙ্করীপ্রসাদ বসু একটি মূল্যবান অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তা হল -

“পরিবেশ চিত্রণে এবং চরিত্রাঙ্কনে বিদ্যাপতির বৈচিত্র্য গোবিন্দদাসে মিলে না। গোবিন্দদাসও নানা প্রকার অভিসারের কথা জানাইয়াছেন - দিবাভিসার, হিমাভিসার, গ্রীষ্মাভিসার, শুল্লাভিসার ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের অভিসারের পার্থক্য গোবিন্দদাসে যেরূপ নিখুঁত ও শিষ্ট, বিদ্যাপতিতে সেরূপ নয়। কিন্তু গোবিন্দদাসের ঐ বৈচিত্র্যের পিছনে আছে অলঙ্কারের কলাপাঠ - বিদ্যাপতি সেখানে জীবনানুসারী। সেইখানেই বিদ্যাপতির জয়।”^৯

গোবিন্দদাসের আর একটি শ্রেষ্ঠতম অভিসার পর্যায়ের পদের সঙ্গে বিদ্যাপতির পদের যদি তুলনা করা হয় সেখানেও দেখা যাবে ভাববস্তু এক, পার্থক্য শুধু কাব্যরূপের।

বিদ্যাপতির পদ -

“ঘন ঘন গরজয়ে ঘন মেহ বরিখয়ে দশদিশ নাহি পরকাসা।
পথ বিপথছঁ চিহ্নয়ে না পারিয়ে কোন পুরয়ে নিজ আসা।।
মাধব আজু আয়লুঁ বড়বন্ধে।”^{১০}

আলোচ্য পদটি থেকেও আমরা বুঝতে পারি শ্রীমতী রাধা তার অভিসারে যাত্রাপথের প্রতিবন্ধকতার বিবরণ দিচ্ছেন। কিন্তু গোবিন্দদাস যখন রাধার যাত্রাপথের বিবরণ দিচ্ছেন -

“মাধব কি কহব দৈব বিপাক।
পথ আগমন কথা কত না কহিব হে
যদি হয় মুখ লাখে লাখ।।
একে কুলকামিনি তাহে কুহ্যামিনি
ঘোর গহন অতিদূর।
আর তাহে জলধর বরিখয়ে ঝরঝর
হাম যাওব কোন পূর।।”^{১১}

উভয় পদেই রয়েছে শ্রীমতী রাধার অভিসারে আগমনের প্রতিবন্ধকতার বিবরণ। অন্ধকার দুর্গম পথ, মেঘের প্রবল বর্ষণ, কণ্টক দিশাহীন পথ দুই স্থানেই আছে। কিন্তু বিদ্যাপতির পদের তুলনায় গোবিন্দদাসের পদ অনেক বেশি কাব্য লক্ষণাক্রান্ত। এই বিষয়ে শঙ্করীপ্রসাদ বসুর মন্তব্যটি বেশ প্রাসঙ্গিক –

“বিদ্যাপতিতে কবিকল্পনার মৌলিকতাও অনেক বেশী। গোবিন্দদাস, অলঙ্কারানুসরণ করিয়া এবং রীতিবদ্ধ বিভিন্নতাকে মানিয়া, নানা প্রকার অভিসারের কথা লিখিয়াছেন, তাঁহার অসামান্য সাঙ্গীতিক প্রতিভা গভীরতম সুরে নিবিড়তম আবেগকে স্পন্দিত ও প্রমত্ত করিয়াছে; কিন্তু বিদ্যাপতির উন্মুক্ত কল্পনা নানা ভাব ও পরিবেশাশ্রয়ে যেভাবে অভিসারিণীকে দেখিয়াছে, গোবিন্দদাস সেই ব্যাপকতার সন্ধানী হন নাই।”^{২২}

এরপরে যদি আমরা চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাসের পদের তুলনা করি সেখানেও দেখা যাবে –

চণ্ডীদাসের পদ -

“এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া তিতিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে।”^{২৩}

গোবিন্দদাসের পদ -

“অম্বর ভরি নব নীরদ ঝাঁপ।
কত শত কোটি শবদে জিউ কাঁপ।।
তঁহি দিঠি জারত বিজুরিক জালা
ইথে জনি মন্দির ছোড়ই বালা।।
ঐছন কুঞ্জ একলি বনমালি।
অন্তর জরজর পন্থ নেহারি।।”^{২৪}

দুটি পদেই শ্রীকৃষ্ণের অভিসার রয়েছে কিন্তু গোবিন্দদাসের এই পদে রাধা এবং কৃষ্ণের বিরহ বেদনা একই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে। গোবিন্দদাসের পদে আমরা রাধার প্রেমের ঐকান্তিকতা পাই যিনি কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে অভিসারে যাত্রা করছেন কিন্তু চণ্ডীদাস যে নায়িকাকে আঁকলেন তিনি একজন চিরন্তনী নারী হয়ে উঠলেন। একইসঙ্গে তার বেদনা এবং গর্ব-এই দুটি ছবি পাশাপাশি আঁকছেন চণ্ডীদাস। চণ্ডীদাসের এই পদে নারী মনস্তত্ত্বের একটা অসাধারণ ছবি আছে। তাঁর একান্ত প্রিয়জন বৃষ্টিতে ভিজছে তাই তার বেদনা আর গর্ব কারণ কৃষ্ণ তার জন্য অভিসারে এসেছে। আমরা আগেই বলেছি গোবিন্দদাসের পদ অনেক বেশি কাব্যলক্ষণাক্রান্ত, এই পদটিও তার একটি দৃষ্টান্ত।

চৈতন্য পরবর্তীকালের আর একজন কবি হলেন জ্ঞানদাস। জ্ঞানদাসকে বলা হয় ‘চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য’। চণ্ডীদাসের পদের সঙ্গে জ্ঞানদাসের পদের যদি তুলনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে অভিসারের যে মূল কথা অসংখ্য বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে অভিসারে যাওয়া তা সে প্রাকৃতিক বাধা হোক বা মানুষী বাধা তা চণ্ডীদাসের পদে আছে, শ্রীমতী রাধা নিজে সখীর কাছে তার অভিসারে যাওয়ার প্রতিবন্ধকতার কথা উল্লেখ করেছেন একটি পদে –

“কহিও তাহার ঠাই যেতে অবসর নাই
অফুরান হল গৃহ-কাজে।
শাশুড়ী সদাই ডাকে নন্দী প্রহরী থাকে
তাহার অধিক দ্বিজরাজে।।
সজনি কোপ করেন দুরন্ত।
গৃহকর্ম করি ছলে বিপিনে যাইবার বেলে

আকাশে প্রকাশ ভেল চন্দ্র ।।

ও কুলে বিচ্ছেদ ভয় এ কুলে নহিলে নয়

সুসারিতে নিশি গেল আধা ।

আসিয়া মদন সখা হেন বেলে দিলে দেখা

কহ দূতি কি করিবে রাধা ।।”^{১৫}

শ্রীমতী রাধা অভিসারে যাত্রার পথে প্রাকৃতিক বাধার সাথে সাথে যে মানুষী বাধারও সম্মুখীন হয়েছিলেন – চণ্ডীদাসের লেখা এই পদটি তার একটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত। কিন্তু জ্ঞানদাসের পদে আমরা দেখি –

“কানু অনুরাগে হৃদয় ভেল কাতর

রহই না পারই গেহে ।

গুরুদুরুজন ভয় কিছু নাহি মানয়ে

চীর নাহি সম্বর দেহে ।।

দেখ দেখ নব অনুরাগক রীত ।

ঘন আক্খিয়ার ভুজগভয় কত শত

তৃণছ না মানয়ে ভীত ।।

সখিগণ সঙ্গ তেজি চলু একসরি

হেরি সহচরীগণ ধায় ।

অদভুত প্রেম- তরঙ্গে তরঙ্গিত

তবলু সঙ্গ নাহি পায় ।।”^{১৬}

জ্ঞানদাসের এই পদটির মধ্যে অভিসারের উপযুক্ত পটভূমি আছে কিন্তু অভিসারিকা রাধার অভিসারে যাত্রার প্রতিবন্ধকতার কোনো ছবি পদটিতে আমরা পাই না। পদটির মধ্যে আমরা যা পাই তা হল অজস্র বাধা বিপত্তি এবং ভয় ভাবনাকে অতিক্রম করে শ্রীমতী রাধার সখী পরিবৃত্ত হয়ে আনন্দময় অভিসার যাত্রার কথা। আসলে জ্ঞানদাস ছিলেন চৈতন্যোত্তর যুগের কবি এবং দীক্ষিত বৈষ্ণব ভক্ত ছিলেন। কবিতা রচনাকে হয়তো তিনি ধর্ম সাধনারই একটি অঙ্গ হিসাবে দেখেছিলেন। পূর্বরাগ, অনুরাগ এবং আক্ষেপানুরাগ পর্যায়ের পদে তিনি যতখানি জনপ্রিয়তার শীর্ষে ছিলেন, অভিসার পর্যায়ের পদে তিনি ততখানি জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছাতে পারেননি।

আমরা জানি সাহিত্য সমাজের দর্পণ। সমাজে যা কিছু সৃষ্টি হবে তার প্রভাব সাহিত্যের মধ্যে পড়বেই, বৈষ্ণব পদাবলীও তার ব্যতিক্রম নয়। ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরবর্তীকালে বৈষ্ণব কবিতায় শুরু হল এক অভিনব পরিবর্তন। জয়দেবকে কেন্দ্র করে পদাবলী সাহিত্যে যে নতুন ধারার সূচনা হয়েছিল চৈতন্যদেবের পরবর্তীকালেও সেই ধারা অক্ষুণ্ণ ছিল। চৈতন্য পূর্ববর্তীকালে যেসমস্ত পদকর্তা পদ রচনা করেছেন তাঁরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রেক্ষাপটে পদ রচনা করেননি। রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলাই তাদের কাব্যের বিষয়বস্তু। কিন্তু চৈতন্য পরবর্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বাতাবরণে যেসমস্ত পদকর্তা পদ রচনা করেছেন তাঁদের ব্যক্তিগত প্রেমভাবনা কবিমনের অচেতন অবস্থাতেই প্রকাশ করেছেন। উভয় যুগের পদকর্তাদের রচনার মধ্যে পার্থক্য থাকলেও একসময় ধর্মসঙ্গীতরূপে আবির্ভূত হওয়া বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে ধর্মের থেকেও অনেক বেশি মানবীয় ব্যাপার যুক্ত হয়ে আছে। তাই এতকাল পেরিয়েও বৈষ্ণব পদাবলী আজও আমাদের কাছে সমান জনপ্রিয়।

Reference:

১. মহারাজ, দেবগোস্বামী শ্রীধর, ‘শ্রীশিক্ষাষ্টক’ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা, দ্বিতীয় মুদ্রণ বঙ্গাব্দ ১৪১৩, খৃষ্টাব্দ ২০০৭, শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ, কোলেরগঞ্জ, নবদ্বীপ, নদীয়া, পিন নং-৭৪১৩০২, পৃ. ২৩

২. মুখোপাধ্যায়, ধ্রুবকুমার, শ্রীপূজ্যপাদ শ্রীরূপ গোস্বামীর ‘উজ্জ্বলনীলমণি’ তথ্যে ও তত্ত্বে, ‘পুনর্মুদ্রণ : এপ্রিল ২০২১, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ৩৫
৩. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত), কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ লঘু সংস্করণ, অষ্টম মুদ্রণ ২০২১, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি ১১০ ০০১, পৃ. ৫
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘পুনশ্চ’ কাব্যগ্রন্থ, ‘বিচ্ছেদ’ কবিতা, পঞ্চম সংস্করণ, আষাঢ় ১৪০০, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১৭, পৃ. ৫৪
৫. মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ, ‘বৈষ্ণব পদাবলী’, অষ্টম মুদ্রণ মার্চ ২০২১, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা লি, ৩২-এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা ৭০০-০০৯, পৃ. ৯৫
৬. তদেব, পৃ. ৬২৩
৭. মিত্র, শ্রীখগেন্দ্রনাথ ও মজুমদার শ্রীবিমানবিহারী (সম্পাদিত), ‘বিদ্যাপতির পদাবলী’, নতুন সংস্করণ দোলপূর্ণিমা ১৩৫৯, কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৩ নং কাশীমিত্র পাট ঈট, বাগবাজার, কলিকাতা, পৃ. ৭৭
৮. মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ, ‘বৈষ্ণব পদাবলী’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৭
৯. বসু, শঙ্করীপ্রসাদ, ‘চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি’, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯১১, বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড ১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬, পৃ. ২৭৩
১০. মিত্র, শ্রীখগেন্দ্রনাথ ও মজুমদার শ্রীবিমানবিহারী (সম্পাদিত), ‘বিদ্যাপতির পদাবলী’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮
১১. মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ, ‘বৈষ্ণব পদাবলী’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮২
১২. বসু, শঙ্করীপ্রসাদ, ‘চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি’, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫
১৩. মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ, ‘বৈষ্ণব পদাবলী’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭
১৪. তদেব, পৃ. ৬৩২
১৫. তদেব, পৃ. ৫৫
১৬. তদেব, পৃ. ৪০৬